মৎস্য ও প্রাণী পালন

মৎস্য ও প্রাণীপালক বন্ধুদের উৎসাহিত করতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণের গ্রামীণ পত্রিকা

Ramsai KVK, Jalpaiguri

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা | ডিসেম্বর, ২০১৬ | পৌষ, ১৪২৩

৭ম বিশ্ব আয়ুর্বেদিক কংগ্রেস

বিকাশ কান্তি বিশ্বাস ঃ ৭ম বিশ্ব আয়ুর্বেদিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজ্যের সায়েন্স সিটিতে গত ২-৪ ডিসেম্বর ২০১৬। এই কংগ্রেস উপলক্ষ্যে প্রাণী চিকিৎসায় ভেষজ উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারী কাউন্সিল সভাগৃহে। এই আলোচনাচক্রটির ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। ভেষজ ঔষধের ব্যবহার প্রাণীকল্যানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক বিশ্বাস দেশের তথা বিশ্বের প্রাণী বিজ্ঞানীদের দেশীয় প্রযুক্তি বিশেষ গাছগাছড়ার গুণাবলীর উপর গবেষণা জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। অ্যালোপাথিক ক্রম বর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি তথা প্রাণীপালকদের ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টি ডি ইউ-এর উপাচার্য্য অধ্যাপক দর্শন শংকর, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসা ও প্রাণী বিজ্ঞান অণুষদের ডিন অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলোচনা চক্রের মুখ্য আয়োজক অধ্যাপক তপন মন্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের তথা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক প্রাণী বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন। এই একটি গোল টেবিল আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এই মাধ্যমে প্রাণীপালনে ভেষজ পদার্থের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন হয় যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।।

খাদ্য উৎসব - 'আহারে বাংলা'

অপরাজিতা বিশ্বাস ঃ কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গনে গত ২২-২৫ অক্টোবর ২০১৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল 'আহারে বাংলা' নামে পাঁচদিন ব্যাপী খাদ্য উৎসব। রাজ্যসরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। খাওয়া বাদ দিয়ে বাঙালিদের অস্তিত্ব নেই - বলে মনে করেন শ্রী মুখোপাধ্যায়। এই ধরনের অনুষ্ঠানকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ধন্যবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জনাব জাভেদ খান, WBLDC-এর চেয়্যারম্যান শ্রী অনন্তদেব অধিকারী, বিভাগীয় সচিব শ্রী রাজেশ সিন্‌হা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পুর্ণেন্দু বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই 'আহারে বাংলা' উৎসব শহর ও শহরতলির মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এই ধরনের উৎসব শুধুমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যেই চরিতার্থ করে না বরং অর্থনৈতিক লাভ ও হয় বলে জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো রকমের খাবার পাওয়া গেছে প্রায় শতাধিক স্টলে। এই মেলায় প্রায় ১.৫ কোটি টাকার খাবার বিক্রি হয়, যা গত বছরের থেকে অনেক বেশী। আগামী বছর এই উৎসব আরও সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত করা হবে বলে জানান প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ।

২০তম জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ

কেশব ধারা ঃ ২০তম জাতীয় প্রাণীসম্পদ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হল হুগলী জেলার কামারপুকুরে গত ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে এই প্রাণীসম্পদ সপ্তাহের উদ্‌যাপন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, খামারী বন্ধু তথা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত প্রাণীসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ, কৃষি বিপণন মন্ত্রী শ্রী তপন দাশগুপ্ত, রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীমতী অসীমা পাত্র, বিভাগীয় সচিব শ্রী রাজেশ সিন্‌হা, অধিকর্তা ডঃ আনন্দ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাণী বিজ্ঞানী ও খামারীদের মুখোমুখি বসে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয় যা সকলের কাজে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এগিয়ে থাকা প্রাণীপালক, প্রাণীপালনের পরিষেবায় যুক্ত প্রাণীবন্ধুদের উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রাণীচিকিৎসকদেরও সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা হুগলী জেলার প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহঅধিকর্তা ডাঃ প্রবীর পাঠক রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কন্‌ফেডারেশন অফ্ ইউনিভার্সিটির সভায় সম্মানিত হলেন উপাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কন্‌ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির বার্ষিক সভার আয়োজন হল কলকাতার সায়েন্সসিটি সভাগৃহে গত ৫ই অক্টোবর ২০১৬। ত্রিপুরার রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী তথাগত রায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের ৮৩৫টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যসম্পর্কিত একটি পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রী তথাগত রায়। কন্‌ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির সভাপতি ডঃ প্রিয়রঞ্জন ত্রিবেদী সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাসকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং স্মারক প্রদান করেন শ্রী তথাগত রায়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে স্মারক প্রদান করা হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক অধ্যাপক অরুণাশিস্ গোস্বামী ও অধ্যাপক সমিত নন্দীকে।

বিশ্ববিদ্যালয়েকে উৎকর্ষের স্বীকৃতি দিল আই. সি. এ. আর.

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) আগামী পাঁচ বছরের জন্য উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষনা করল। বিশিষ্ট প্রাণী বিজ্ঞানী তথা পশু অনুসন্ধান পরিষদ (IVRI) প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ এম. পি. যাদবের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও গবেষণার গুণগত মান যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করলে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ তা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস সন্তোষ ব্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের অবদানের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাম্মানিক ডি.এস. সি. পেলেন প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ বাবুলাল টুডু

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রাণী বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ও সাঁওতালী ভাষায় সাহিত্য চর্চার অসামান্য স্বীকৃতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাক্তনী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে অশোকনগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডঃ বাবুলাল টুডুকে সাম্মানিক ডি. এসসি. প্রদান করল সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৬ পুরুলিয়ায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাম্মানিক ডি.এসসি. প্রদান করা হয়। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য তথা রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা কর্মরত বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ টুডু সাম্মানিক ডি.এসসি. পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত হয়েছে বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। ডঃ টুডুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সম্মানিত করা হবে বলে জানান অধ্যাপক বিশ্বাস।

সম্পাদকীয়

কেবলমাত্র আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যাপক অংশের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রয়োজন স্থানীয়ভিত্তিক প্রচলিত প্রযুক্তির মান উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ধারাবাহিক প্রয়োগ। তবেই সম্ভব বহমান উন্নয়ন বা Sustainable development। গ্রাম-বাংলায় অনেক ওষধি গাছ আছে - আছে অনেক দেশীয় প্রযুক্তি যা ব্যবহার করে প্রাণীসম্পদের স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রাণীউৎপাদনের বহমানশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। কম খরচে, কম পরিশ্রমে, আত্মনির্ভর হয়ে ভাল ফল পেতে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যকীয়। জৈব-বিচিত্রতা মানবজগতে এনে দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা। আমাদের গ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদে খুবই উন্নত যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রাণীজগৎ হতে পারে আরও উন্নত। উপেক্ষা, অনাদরে এবং অব্যবহারে অনেক দেশীয় প্রযুক্তির অবলুপ্তি ঘটছে প্রতিনিয়ত। প্রাণী কল্যাণ তথা মানবকল্যাণে দেশীয় প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে সঠিক মূল্যায়ণ, সংরক্ষণ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। লক্ষ্য রাখতে হবে অপব্যবহার বা কোন কারণে দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগে যেন প্রাণী বা মানবজগতের কোন অপকার না হয়।

এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই ''মৎস্য ও প্রাণীপালন'' গ্রামীণ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা পাঠক সমাজের কাছে প্রশংসিত হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। এই সংখ্যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ণে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার। লেখাগুলি গ্রামীণ পত্রিকার পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

ছাত্র সংসদের উদ্যোগে - 'উজান'

শামিম রেজা ঃ ছাত্র সংসদ ভেটেরিনারী ও ছাত্র সংসদ ডেয়ারী ফ্যাকাল্টির যৌথ উদ্যোগে গত ১১-১২ নভেম্বর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎযাপিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রক্তদান শিবির, প্রাণী চিকিৎসা শিবির, বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনে সচেতনতা, খামারী বন্ধুদের সাথে আলোচনা এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ 'উজান' ব্যাপক সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসে। প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। উদ্বোধন করে অধ্যাপক বিশ্বাস আশা প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রছাত্রীরা সার্বিক সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। ছাত্রছাত্রীরা সমাজের মেরুদন্ড, যে কোন চাপে ছাত্রছাত্রীরা শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলার পথে এগিয়ে যাবে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের মার্গ দর্শন করাবেন বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা, প্রাণী চিকিৎসা ও প্রাণীবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ, ডেয়ারী অনুষদের ডিন অধ্যাপক তরুণ মাইতি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শিক্ষাকর্মী রক্তদান করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অনুপম রায় ও সম্প্রদায়সহ অন্যান্য অনেকেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আলোচনাচক্র

গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিতহল ২৫শে নভেম্বর, ২০১৬বেলগাছিয়াতে। উক্ত আলোচনাচক্রে মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সমীর সুভাষ রায়চৌধুরী, ডিন, বেনেডিক্ট কলেজ কলাম্বিয়া। আলোচনাচক্রের পৌরহিত্য করেন উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস।

পাঠকের কলম

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মৎস্য ও প্রাণী পালন' খামার পত্রিকাটি প্রকাশনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই ধরনের একটি পত্রিকা আমাদের মতো খামারী বন্ধুদের সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন লেখা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে। রঙীন এই খামার পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণীপালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মৎস্য, প্রাণীপালন বা দুধের প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় আমাদের মত বেকার যুবকদের উৎসাহিত করতে মৎস্য ও প্রাণীপালন আরও অগ্রণী হবে এই প্রত্যাশা রাখছি। ''মৎস্য ও প্রাণীপালন'' এর সমৃদ্ধি কামনা করি।

বনমালী রায়, ময়নাগুড়ি

অ্যাকুয়াপোনিক্সের উপর আলোচনাচক্র

বিশ্বরূপ সাহা ঃ মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে 'অ্যাকুয়াপোনিক্স' এর উপর একটি আলোচনা চক্র আয়োজিত হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের চক্‌গড়িয়া ক্যাম্পাসে ২৯শে নভেম্বর, ২০১৬। আলোচনা চক্রের মূখ্য বক্তা হিসাবে আলোচনা করেন গ্রাটিস্ অধ্যাপক ইউ.এস.এ অধ্যাপক চন্দ্রশেখর রায়চৌধুরী। উক্ত আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পুর্ণেন্দু বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কৃষি সম্পর্কিত পরামর্শদাতা ডঃ প্রদীপ মজুমদার, উদ্যান পালনের অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ পি প্রামাণিক, যুগ্ম অধিকর্তা মৎস্য দপ্তরের ডঃ শৈলেন বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা ও মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক বিপুল দাস। অ্যাকুয়াপোনিক্স এর গুরুত্ব মৎস্য পালন ও মৎস্য যুক্ত সুসংহত চাষে অপরিসিম বলে জানান অধ্যাপক রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ প্রদীপ মজুমদার অ্যাকুয়াপোনিক্স ব্যবস্থার সদর্থক উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন করে চাহিদা সৃষ্টি সম্ভব বলে জানান। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন যে খাদ্য নিরাপত্তায় 'অ্যাকুয়াপোনিক্স' গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারে একটি পাইলট প্রকল্প নেওয়ার ভাবনা চিন্তা করছে বলে জানান তিনি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তার জন্য আলোচনা চলছে। মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক বিপুল কুমার দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান। সমগ্র আলোচনা চক্রে মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক শিক্ষিকা, গবেষক, পি জি ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় দুগ্ধ দিবস

সুব্রত বাগ ঃ পদ্মবিভূষণ ডঃ ভার্গিস্ ক্যুরিয়ান এর জন্ম দিন উপলক্ষে 'জাতীয় দুগ্ধ দিবস' পালিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেয়ারী ফ্যাকাল্টি মোহনপুর ক্যাম্পাসে ২৬শে নভেম্বর ২০১৬। এই দুগ্ধ দিবসের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পুর্ণেন্দু বিশ্বাস। অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন, দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধজাত পদার্থের চাহিদা অপরিসীম। প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা তুলনায় যোগান কম থাকার কারণ ডেয়ারী শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ডেয়ারী ফ্যাকাল্টির ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেয়ারী অনুষদের ডিন অধ্যাপক তরুণ কুমার মাইতি, প্রাণী চিকিৎসা ও প্রাণীবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ । প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

জনস্বাস্থ্য সম্মেলন

কুনাল বটব্যাল ঃ গত ২-৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ অ্যাসোসিয়েশান ও পাবলিক হেলথ্ এর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ছত্রিশগড়ের কামধেনু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্গ ক্যাম্পাসে। প্রাণী ও মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একীকরণ সম্পর্কিত একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। সারা দেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রাণীচিকিৎসক তথা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান অধ্যাপক বিশ্বাস। সংগঠনের পক্ষ থেকে অধ্যাপক বিশ্বাসকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং স্মারক প্রদান করা হয়। এই সম্মেলনে গবেষণা পত্রের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি পান পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ কুনাল বটব্যাল।

'মৎস্য ও প্রাণী পালন'-এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ

শতাব্দী দাশঃ গত ৩রা অক্টোবর, ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিষাণ আবাসন সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত খামারী পত্রিকা - ''মৎস্য ও প্রাণীপালন''-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে উপাচার্য্য অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফার্ম জার্নালটি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খামারী বন্ধুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে তিনি মনে করেন। মৎস্য ও প্রাণীপালনে যুক্ত ব্যক্তিদের গঠনমূলক সমালোচনায় ''মৎস্য ও প্রাণীপালন'' সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ফার্ম জার্নালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যলয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা, গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকর্তা অধ্যাপক অরুণাশিস্ গোস্বামী। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে রাজ্যে কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে যুক্ত বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। জলবায়ুভিত্তিক প্রাণী ও মৎস্য পালনের আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের অবহিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপকগণ।

মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা
মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান (ITK) অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং একটি প্রদত্ত জাতিগোষ্ঠীর জন্য জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা পরিচিত এবং অপরিচিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভিত্তি তৈরি করে। এটা মৎস্য চর্চাসহ টেকসই চাষ সিস্টেমের নকশা তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। এই জীবিকা নির্বাহের উপায় বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী গ্রহণ উন্নয়ণ এবং হস্তক্ষেপ মাধ্যমে উদ্ভাবন বজায় রাখে। বিশ্বজুড়ে সম্পদ দরিদ্র কৃষক ও প্রান্তিক সমাজে, একটি লাভজনক, ফলপ্রদ এবং পরিবেশগত টেকসই হিসেবে মৎস্য রোগ চিকিৎসার জন্য উদ্ভিদভিত্তিক ওষুধ কাজে লাগিয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান হল সঞ্চিত জ্ঞান, দক্ষতা ও স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত প্রযুক্তি। যেহেতু মানবজাতির বিবর্তনে মানুষের সম্পদ এবং অবস্থান নির্দিষ্ট পন্থার সঙ্গে ন্যস্ত করা হয়েছে যেমন কৃষি, মৎস্য, দুগ্ধ, পশুপালন, আয়ুর্বেদীয় ঔষধ এবং আবহাওয়া অধ্যয়ন ইত্যাদি। মাছ চাষীদের দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান ঐতিহ্যগতভাবে যুক্ত। কৃষকদের জ্ঞান গ্রামীণভিত্তিক চলতি নিয়ম বলে ধরে নেওয়া হয়। যা অনুসরণ করতে বংশপরম্পরায় আলাদা পরিস্থিতিগত সীমাবদ্ধতা দিয়ে মানিয়ে নিতে হয়। পূর্বপুরুষদের পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত উদ্ভাবনকে মূল্যবান নতুন প্রযুক্তি সহায়তা সঙ্গে মিশ্র করা প্রয়োজন। সনাতন জ্ঞান সময় পরীক্ষিত এবং মাছ চাষ প্রযুক্তির মাত্রা বুঝতে আনুষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে মাত্রা এবং দিকনির্দিষ্ট পরিবর্তন দাবী করতে সাহায্য করে। সুতরাং, দেশীয় উদ্ভাবনের রেকর্ডিং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা অন্যথায় শীঘ্রই ভবিষ্যতে স্বীকৃতি ছাড়া অচল হবে। বর্তমানে আধুনিক তথ্য সিস্টেম গুরুত্ব দিয়ে সুরাহা করছে বিশ্বের উৎপাদনশীল বিধিব্যবস্থার স্থায়িত্বের বিষয়টি। ক্রমাগত দারিদ্র্য, বায়ু এবং জল দূষণ, মাটির ক্ষয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদির জন্য বর্তমানে উন্নয়নের ধরণ সম্পর্কে জ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে। বহুমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবায়নের সঙ্গে, আমাদের উৎপাদনশীল প্রচেষ্টা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পদ্ধতিতে এবং মাছ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে অর্জন করা যেতে পারে। দেশীয় জ্ঞান কৃষক জনগণের স্মৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংরক্ষিত হয় এবং এটা গল্প, গান, লোকাচারবিদ্যা, নীতিবাক্যমূলক গ্রন্থবিশেষ, নাচ, কাল্পনিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথাগত ধরণ স্থানীয় ভাষা ও শ্রেণীবিন্যাস, কৃষি, সরঞ্জাম উপকরণ, উদ্ভিদ প্রজাতি ও পশু প্রজাতি, সম্প্রদায় আইন আকারে প্রকাশ করা হয়।

অন্যান্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন উপর কৃষকদের উদ্ভাবনের প্রধান সুবিধার এটা সামান্য বা কোন খরচ ছাড়াই এবং সহজেই পাওয়া যায়। এই উদ্ভাবন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, ও টেকসই হয় এবং গ্রামীণ কৃষক ও উৎপাদনকারীদের ন্যূনতম ঝুঁকি জড়িত, এবং সর্বোপরি, তারা ব্যাপকভাবে সম্পদ সংরক্ষণ করে বলে মনে করা হয়। কৃষকদের উদ্ভাবন উৎসাহিত করে সক্রিয় কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণ মানুষ একে অপরের উপর আরও নির্ভরশীল। মৎস্য চাষী মৎস্যচাষের কয়েকটি দ্বন্দ্ব গ্রহণ করেছে। মাছ চাষে রোগ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে মৎস্য চাষী দ্বারা দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান-এর ব্যবহার নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১) রসুন (Allium satium) পেস্ট প্রয়োগ ঃ এটা ভাইরাসজনিত আক্রমণে বিশেষত yearlings এবং মাছের পোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই রোগের কারণে আবর্ত এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এটি মাছের রোগ নিরাময়ের জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। রসুন (Allium satium) ১kg পেস্ট করে তারপর এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাজা জল প্রায় ২০ লিটার সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। তারপর এই মিশ্রণ আক্রান্ত পুকুরের উপর স্প্রে করা হয়। মাছ চাষীরা ভালো ফল পান। বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেন যে, রসুনে একটি রাসায়নিক উপাদান ALLICIN থাকে যা antimicrobs যা মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে থাকে। নিবিড় গবেষণায় larvicidal, antifungal এবং রসুনের antibacterial প্রভাব মাছের উপর তৈরি করা হয়েছে। ঐ সব গবেষণায় ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া। Slaureus, Sltyphi, Elcoli এবং Listeria monocytogenes প্রভৃতি প্যাথোজেনিক প্রজাতির বিরুদ্ধে রসুনের (Allium satium) দমনমূলক কার্যকলাপ পাওয়া যায়। সকল প্যাথোজেনিক প্রজাতির রসুন সংবেদনশীল (80%) ছিল, অধিকাংশ E coli ছিল।

২) রসুন বাটা এবং সাধারণ লবণের মিশ্রণ প্রয়োগ ঃ গ্রামের পুকুরে মাছ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাধারণত ২ কেজি রসুন বাটা এবং ৫ কেজি সাধারণ লবণ একটি মিশ্রণ করা হয়। তারপর এটা মাছ পালনের পুকুরে প্রয়োগ করার আগে জল ২০-২৫ লিটার মিশ্রিত করা হয়। প্রচলিত লবণের ক্ষমতা রসুনের সঙ্গে প্রয়োগ করলে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে মাছকে আলাদা করে রাখা যায়।

৩) হলুদ, চুন এবং সাধারণ লবণ প্রয়োগ ঃ ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ বিরুদ্ধে প্রতিষেধক এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৫০০ গ্রাম হলুদ, ১ কেজি চুন ও ৫ কেজি সাধারণ লবণ একটি মিশ্রণ মাছ পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে দেখা যায়। তিনটি উপাদানই জীবাণুনাশক হিসাবে সাহায্য করে। এছাড়াও pH চুন এর প্রয়োজনীয় মাত্রা বজায় রেখে মাছের অনুকূল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪) পুকুরে নিম (Azadirachta indica) পাতার পেস্ট এবং চুন প্রয়োগ ঃ বাহ্যিক আঘাতে মাছের লাল ক্ষত স্থান সারিয়ে মাছকে রক্ষা করে। নিম পাতা বেটে একটি পেস্ট তৈরি করে তার মধ্যে চুন যোগ করা হয় (নিম ঃ চুন = ১ : ২) পেস্ট ২-৩টি ভাগে সমানভাবে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অনেক ২৫-৩০ লিটার জন ধারণক্ষমতা পাত্রে জল দিয়ে যোগ করা হয়, স্থানীয়ভাবে২"handi" বলা হয়। বাহ্যিক আঘাতে মাছের লাল ক্ষতস্থান সারানোর জন্য প্রস্তুত দ্রবণে ডুবানো হয় প্রায় আধ ঘন্টার জন্য এবং পুকুরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ভাগ (যদি থাকে) জল দিয়ে মিশিয়ে পুকুরে জলে স্প্রে করা হয়। এই পেস্টের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল কার্যকলাপের কারণে মাছের লাল ক্ষত স্থান সারিয়ে উঠতে পারে।

৫) পুকুরে নিমপাতার পেস্ট এবং হলুদ প্রয়োগ ঃ মাছের ক্ষত, লাল অঞ্চলে এবং মাছের দেহ অন্যান্য বাহ্যিক রোগের চিকিৎসার জন্য। নিম পাতা বেটে একটি পেস্ট তৈরি করা হয়। হলুদ (২৫০ গ্রাম) পেস্টের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং সঠিকভাবে মিশ্রিত করা হয়। তারপর পেস্টটিকে ২৫-৩০ লিটার জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা এবং সমানভাবে পুকুরে স্প্রে করা হয়। যেসব এলাকায় রোগ প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে প্রতিষেধক হিসাবে কার্যকর করা হয়। ব্যবহৃত পেস্টটি সহজলভ্য এবং সস্তা। মাছের মৃত্যুহার কমানোর জন্য নিম এবং হলুদ নির্যাস এর মিশ্রণে ডোবান প্রয়োজন। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে নিম ৪টি প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ারোধী কার্যকলাপ আছে এবং প্রথম তিন টি ব্যাকটেরিয়া E.coli চেয়ে নিমের প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা দেখিয়েছে।

৬) পুকুরে ছাই ছড়ানো ঃ পুকুরে মাছের রোগ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খড় পুড়িয়ে এবং এটির ছাই মাছের পুকুরের মধ্যে ছড়ানো হয় বা মাঝে মাঝে পুকুরের এক কোণে জড়ো করে রাখা হয়। পুকুরে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষেধক হিসাবে খড় পোড়ানো ছাই প্রয়োগ করা হয়। এতে খরচ কম এবং উপকরণ সহজলভ্য হয়। ধানের খড় পোড়ানো ছাই প্রয়োগ করার পদ্ধতি জলের গুণমান বজায় রেখে মাছের বৃদ্ধি ঘটায়। এটা রিপোর্ট ছিল নিউট্রালাইজিং প্রভাব এবং বর্ধিত ক্ষারকত্ব ঘটে যখন ছাই পুকুরে প্রয়োগ করা হয়, সবচেয়ে কার্যকর হচ্ছে কাঠ ছাই ৩ টন/ হেক্টর। ছাই এর উচ্চমাত্রায় প্রয়োগ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ভালো ফল দিতে পারে। কৃষকের ছাই চিকিৎসার অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যেহেতু তারা বিনা খরচে ইনপুট হিসাবে ছাই সংগ্রহ করতে পারবেন।

৭) পুকুরে বাঁশের খুঁটি পোঁতা ঃ মাছের উকুন নিয়ন্ত্রণ করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। বাঁশের খুঁটি পুকুরের নিচে পোঁতা হয়। এটি বিশেষভাবে তখন প্রয়োগ করা হয় যখন মাছ উকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সংক্রমণের মাছ কঠিন পদার্থের বিরুদ্ধে তাদের শরীর ঘসে। এখানে বাঁশের খুঁটি তাদের শরীর ঘসার জন্য ব্যবহার করে। যার ফলে মাছের উকুন অপসারণের ফলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হয় এই বাঁশের খুঁটি কম বিন্যাস ঘুরপ্যাঁচ জড়িত এবং কৃষকের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রযুক্তি। বাঁশের খুঁটি শরীরে ঘসার ফলে উকুনকে শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

উপরে উল্লিখিত দেশীয় প্রযুক্তি মাছ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যার মোকাবিলায় খুবই টেকসই পদ্ধতি। এই ধরনের ব্যবস্থা কৃষক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কার্যকর রোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রযুক্তি থেকেITK মৌলিক পার্থক্য ITKs প্রথম স্থানীয় মানুষ তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া উপর নির্ভর করে গৃহীত হয় অন্য দিকে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিতে অত্যাধুনিক গবেষণা কাজ করে। আগামী দিনগুলোতে একই জ্ঞান ও প্রযুক্তি আরও নিখুঁত ও সঠিকভাবে করা যেতে পারে। এটা যেমন প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাতে তাদের পিছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, সেটা বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে। এটি সম্পূর্ণ হলে, এটি আরও পরিমার্জন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঙ্গে মিশ্রিত করার দ্বারা তাদের উন্নতি করা সম্ভব হবে। সুদূর ভবিষ্যতে চাষের উন্নতির জন্য উপরে আলোচিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়।

হস্তচালিত মুরগী ডিম পরিস্ফুটন যন্ত্র ঃ একটি সফল উদ্যোগ

সুকান্ত বিশ্বাস ঃ শ্রী পুলক সরকার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত বাউল গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত (অষ্টম শ্রেণী) ৩৮ বৎসর বয়সের পরিশ্রমী, অভিনব চিন্তাধারার একজন দরিদ্র প্রাণীপালক। শ্রী সরকারের নয় সদস্য (মা-বাবা, বড় ভাই-স্ত্রী, তিন সন্তান) সহ বৃহৎ পরিবার মাত্র এক একর জমি এবং ছোট (মাছের খাবার, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা বিক্রয়) ব্যবসা করে সংসার প্রতিপালন করেন। এমতাবস্থায়, শ্রী সরকার তার প্রয়োজনের তাগিদ ও সৎপথে অধিক উপার্জনের লক্ষ্যে এই হস্তচালিত হাঁস-মুরগী ডিম পরিস্ফুটন যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। তিনি কেভিকে ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে উন্নত প্রথায় পাখীর বাচ্চা পরিস্ফুটন যন্ত্রে বাচ্চা ফোটানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, ২০১০-১১ সালে। এরপর, তিনি ব্যবসাভিত্তিক যন্ত্রচালিত পাখীর বাচ্চা স্ফুটন যন্ত্র ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু যন্ত্রচালিত পরিস্ফুটন যন্ত্রের দাম ন্যূনতম ৩.৫-৪.০ লক্ষ টাকার জন্য তার সাধ্যাতীত হয়। তিনি তখন কেভিকের প্রাণী বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ সুকান্ত বিশ্বাসের নিকট এই বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ডিম স্ফুটনের মূলনীতি যথা - তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। এরপরই তিনি তাঁর অভিনব উদ্যোগ দ্বারা এই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে হস্তচালিত মুরগী স্ফুটন যন্ত্র প্রস্তুত করেন। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের দ্বারা তৎক্ষনাৎ এই মেশিন সম্বন্ধীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে নথীভুক্ত করে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ দ্বারা সফলতা লাভ করেন। মেশিনটি তৈরীর স্থায়ী খরচ প্রায় ৪৫,০০০ টাকা এবং আবর্ত খরচ প্রায় ১৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট ৬০,০০০ টাকা মাত্র। মেশিনে বাচ্চা স্ফুটন হার ৮০-৮২ শতাংশ এবং মরণশীলতা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ। প্রতি ডিম চক্রে গড়ে প্রায় ৭৫০-৮০০টি বাচ্চা পাওয়া যায়। একদিনের বাচ্চার দাম ৩০ টাকা করে ৮০০টির দাম = ৮০০ × ৩০ = ২৪,০০০ টাকা। সুতরাং প্রতি চক্রে মোট লাভ (২৪,০০০ - ১৫০০০) = ৯,০০০ টাকা মাত্র।

রজনীগন্ধা চাষে সুধীর ঘোষের সফল কথা

সোমা গিরি ঃ বনগাঁ ব্লকের গোপালনগর গ্রামের অধিবাসী কৃষক বন্ধু সুধীর ঘোষ। তিন বিঘা জমির মালিক সুধীরবাবু তিন বছর আগে পর্যন্ত প্রথাগত পদ্ধতিতে ধান, গম, পাট, তিল, সরষে চাষ করতেন। এই দিয়ে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। তিন বছর আগে উনি প্রথম ১০ কাঠা জমিতে কলকাতা সিঙ্গল জাতের রজনীগন্ধা চাষ করে বুঝতে পারেন চাষটি বেশ লাভজনক। কিন্তু পরের বছরেই দেখতে পেলেন ফুলগুলো বেঁকে যাচ্ছে, গাছগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে, ফলন কমে গেছে ও গুণগতমান খারাপ হওয়ার দরুণ বাজারে দাম পাচ্ছে না। গোপাল নগরের শ্রীমন্তপুর ও দাসপাড়ায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের কাজকর্ম চলাকালীন এক প্রশিক্ষণ শিবিরে গোপালবাবু পরিচয় করেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। মাঠ পরিদর্শনের পর উনি উদ্যানবিদ্যার বিশেষজ্ঞর পরামর্শ মেনে ও উনাদের সহায়তায় বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেমাটোড প্রতিরোধক্ষম প্রাজ্জ্বল জাতের রজনীগন্ধার কন্দ এনে ১ বিঘা জায়গায় চাষাবাদ করেন। সুধীর বাবু নিজে হিসেব দিলে ঐ ১ বিঘা জমি থেকে এক বছরে ৫৮,০০০ টাকার বেচাকেনা করেছেন ও প্রায় ৩৮,০০০ টাকা লাভ করেছেন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরামর্শে উনি এবছর জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কাছে রজনীগন্ধা চাষের প্রকল্পের জন্য আবেদনও করেছেন।

ইলিশ মাছ রক্ষায় মৎস্যজীবিদের করণীয় সতর্কতা

অনিন্দ্য নায়ক ঃ ৯০ মিলিমিটারের কম ফাঁসযুক্ত যেকোন প্রকারের মনোফিলামেন্ট জাল ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ধরা যাবে না। খোকা ইলিশ বা জটিকা ইলিশ মাছের পরিমাণকালে তাদের ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত নদী, মোহনা অঞ্চলে ছোট ফাঁসের জাল ও ২৩ সেমিঃ কম মাপের ইলিশ ধরা যাবে না। সঠিক পরিমাণে ইলিশ মাছকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করতে সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত টানা জাল ব্যবহার করা যাবে না। ইলিশ মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি করার জন্য প্রতি বছর ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে অক্টোবর অর্থাৎ পূর্ণিমার ৫ দিন আগে ও ৫ দিন পরের সময়ে ইলিশ মাছ ধরা যাবে না।

দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রাণী চিকিৎসা

অধ্যাপক তপন মন্ডল

ভেটেরিনারী ফার্মাকোলজি বিভাগ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ তাঁর জীবন জীবিকার স্বার্থে প্রাণীপালনকে বেছে নিয়েছে তাঁর উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে। উপযোগী পরিকল্পনা প্রাণীজ সম্পদের বিকাশের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবে। প্রাণী চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ওষুধ টিকা ইত্যাদির প্রাণী চিকিৎসা উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রাণীপালনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ শতাংশ প্রাণী সম্পদ থাকে গ্রামের ৬৫-৭০ শতাংশ মাঝারি, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষকের কাছে যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল নয়, অথচ এদের জীবন জীবিকার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে প্রাণীপালন। কেবলমাত্র উন্নত প্রযুক্তিই এদের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না - তাই প্রয়োজন স্থানীয় ভিত্তিক প্রচলিত প্রযুক্তির মান উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ধারাবাহিক প্রয়োগ। আমাদের গ্রামে অনেক ওষধি গাছ আছে অনেক দেশীয় প্রযুক্তি আছে যার মাধ্যমে প্রাণীর স্বাস্থ্য যেমন রক্ষা করা সম্ভব তেমনি প্রাণীসম্পদের উন্নয়নও সম্ভব। কম খরচে, কম পরিশ্রমে ভালো ফল পেতে তাই দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার প্রাণী সম্পদের বিকাশে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। প্রাণী বিজ্ঞানী মহলেও তাই আজকের দিনের চর্চার বিষয় হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তি উপযোগী ব্যবহার। রাজ্যের তথা দেশের প্রাণীপালকদের স্বার্থে দেশীয় প্রযুক্তিকে আরও বেশী বেশী করে তুলে ধরার সময় এসেছে। একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না এবং মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে।

স্বাস্থ্য সচেতন আধুনিক সমাজ চায় দূষণহীন ভেজালহীন জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে জৈব খামারে উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য। ভেষজ দেশীয় প্রযুক্তিই এর একমাত্র মাধ্যম। প্রাথমিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে গ্রামবাংলার প্রাণীপালকদের দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগের পছন্দ। দেশীয় গাছ-গাছড়া খামারী বন্ধুদের কাছে পরিচিত ও সহজলক্ষ্য হওয়ার পাশাপাশি ব্যবহারে খরচও কম এবং সুফলও পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের গাছগাছাড়ির উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অবলুপ্ত হতে চলেছে - তাই দেশের যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন বা রূপায়ন করছেন তাঁদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে এই দেশীয় প্রযুক্তিকে কিভাবে সঠিক সংরক্ষণ করে মানুষের কাছে আরও বেশী বেশী করে পৌঁছে দেওয়া যায়। দেশীয় প্রযুক্তির সঠিক মূল্যায়ন সর্বোপরি এর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার অভাব দূর করা দরকার। দেরীতে হলেও ভারত ও রাজ্য সরকার দেশীয় প্রযুক্তির সংরক্ষণ ও রূপায়নে অগ্রণী হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিকে গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া এবং গবেষণালব্ধ ফলকে খামারী বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ ধীর গতিতে হলেও চলছে। অনেক দিন ধরেই আলোচিত ও বিবেচিত হয়ে আসছে কোন গাছ বা উদ্ভিদ কোন রোগ নিরাময়ে কাজে লাগে তার একটি তালিকা দেওয়া হল গ্রামের প্রাণীপালকদের পুনরায় স্মরণ করানোর জন্য এবং প্রয়োজন তার ব্যবহারের জন্য।

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহার
১) তেঁতুল	ট্যামারিন্ডাস ইন্ডিকা (Tamarindus indica)	পাতলা পায়খানা, বোলতার কামড়
২) পেয়ারা	লিন্ডিয়াম গুয়াজ্যাভা (Psidium guajava)	পাতলা পায়খানা
৩) লজ্জাবতী	মাইমোসা পুডিকা (Mimosa pudica)	পাতলা পায়খানা, জ্বর, গলাফোলা, একজিমা, দাঁত নড়া
৪) আপাং	অ্যাকির‍্যানথিস্ আসপেরা (Achyranthes aspera)	পাতলা পায়খানা, জ্বর, চোখের ছানি, দাঁত নড়া
৫) চাকুন্দ	ক্যাসিমিরোয়া টোরা (Casimiroa tora)	পাতলা পায়খানা, লেজ খসা, একজিমা, দাঁত নড়া
৬) গোলমরিচ	পিপার নিগ্রাম (Piper nigrum)	আমাশয়, পাতলা পায়খানা, জ্বর, হাড়ভাঙ্গা, বোলতার কামড়, কুকুরের কামড়, সর্দি, কফ, সাপের কামড়, গলাফোলা
৭) আনারস	অ্যানানাস কোমোসাস (Ananus comosus)	পাতলা পায়খানা
৮) নিম	আজাডিরাচতা ইন্ডিকা (Azadirachta indica)	পাতলা পায়খানা, কৃমি, জ্বর, জন্ডিস, এঁযো
৯) শিমুল	সালমালিয়া ইন্‌সিগ্‌নিস (Salmalia insignis)	পাতলা পায়খানা, আমাশয়
১০) রক্তকম্বল	নিম্ফিয়া নৌচালি (Nymphaea nouchali)	পাতলা পায়খানা
১১) কলা	মুসা প্যারাডিসিয়াকা (Musa paradisiaca)	পাতলা পায়খানা, গরম না হওয়া
১২) বাঁশপাতা	বাম্বুসা অরুন্ডিনাসিয়া (Bambusa arundinacea)	পাতলা পায়খানা
১৩) বহেড়া	টারমিনালিয়া বেলিরিকা (Terminalia bellirica)	পাতলা পায়খানা, পেটফাঁপা
১৪) কুর্চি	হোলারখেনা অ্যান্টিডিসেন্‌টেরিকা) (Holarkhena antidysenterica)	পাতলা পায়খানা, আমাশয়
১৫) শাল	সোরিয়া রোবাস্টা (Shorea robusta)	পাতলা পায়খানা
১৬) খয়ের	অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু (Acacia catechu)	পাতলা পায়খানা
১৭) রসুন	অ্যালিয়াম স্যাটিভাম (Allium sativum)	লেজ খসা, জ্বর, হাড়ভাঙ্গা, আর্থ্রাইটিস, ওটাইটিস, সর্দি, কফ্, নাভির ঘা, ঘা, পেটফাঁপা, ফোঁড়া
১৮) কালমেঘ	অ্যান্ড্রোগ্রাফিস পানিকুলাটা (Andrographis paniculata)	জ্বর, আমাশয়, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, কৃমি
১৯) জোয়ান	ট্র্যাকিস্পারমাম এ্যাম্মি (Trachyspermum ammi)	জ্বর, আমাশয়, গলাফোলা, পালানে প্রদাহ, ক্ষুধামান্দ
২০) আকনাড়ি	স্টিফানিয়া জ্যাপোনিকা (Stephania japonica)	জ্বর, সাপের কামড়, গলাফোলা, পালানে প্রদাহ
২১) শিউলী	নিক্‌ট্যানথিস্ আরবোরট্রিস্‌টিস্ (Nyctanthis arbortristis)	জ্বর
২২) হলুদ	কুরকুমা ডোমেস্‌টিকা (Curcuma domestica)	জ্বর, হাড়ভাঙ্গা, জন্ডিস, ঘা, পেটফাঁপা, ফোঁড়া
২৩) বেল	এ্যাগিল মারমেলশ (Aegle marmelos)	জ্বর, পেটফাঁপা
২৪) পিপূল	ফিকাস রেলিজিওসা (Ficus religiosa)	জ্বর
২৫) হরিতকী	টারমিনালিয়া ছেবুলা (Terminalia chebula)	জ্বর, পেটফাঁপা
২৬) কুকশিমা	ভারভাস্কাম কোরোমনডেলিয়ানাম (Verbascum coromandelianum)	জ্বর, ফুল না পড়া
২৭) আদা	জিঞ্জিবার অফিসিনেল (Zingiber officinale)	জ্বর, সর্দি, কফ, পেটফাঁপা
২৮) অশ্বগন্ধা	উইথানিয়া সোম্‌নিফেরা (Withania somnifera)	জ্বর
২৯) কালজিরা	কুমিনাম সিমিনাম (Cuminum cyminum)	জ্বর
৩০) দুর্বা	সাইনোডন ডাকটাইলন (Cynodon dactylon)	জ্বর, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য
৩১) মটর	পাইসাম স্যাটিভাম (Pisum sativum)	জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য
৩২) অনন্তমূল	হেমিডেসমাস ইন্ডিকাস (Hemidesmus indicus)	আমাশয়, দুধ বাড়াতে, এঁযো, ফোঁড়া, জরায়ুর ঘা
৩৩) থানকুনি	সেন্টেলা এশিয়াটিকা) (Centella asiatica)	আমাশয়
৩৪) পাথরকুচি	সোলিয়াস এ্যারোমাটিকাস (Coleus aromaticus)	আমাশয়
৩৫) গাঁদা	টারগেটেস্ ইরেক্‌টা (Targetes erecta)	আমাশয়, ঘা
৩৬) চিরতা	ফোলিয়া ভারপুলচেলা (Folia varpulchella)	আমাশয়
৩৭) ছাতিম	অল্‌স্টোনিয়া স্কোলারিশ (Alstonia scholaris)	আমাশয়
৩৮) পলাশ	বুটি মোনোস্পারমা (Butea monosperma)	আমাশয়, ঘা
৩৯) বাবুল	অ্যাকাসিয়া অ্যারাবিকা (Acacia arabica)	আমাশয়, দুধ বাড়াতে
৪০) হাড়জোড়া	সিসামপেলস্ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস (Cissampelos quadrangularies)	হাড়ভাঙ্গা
৪১) অর্জুন	টারমিনালিয়া অর্জুনা (Terminalia arjuna)	হাড়ভাঙ্গা
৪২) সজ্‌নে	মোরিঙ্গা অলিফেরা (Moringa Oleifera)	হাড়ভাঙ্গা

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহার
৪৩) তাল	বোরাসাস ফ্ল্যাবেলেফার (Borassus flabellefer)	আরথ্রাইটিস, দুধ বাড়াতে, পেটফাঁপা
৪৪) ধুত্‌রা	ডাটুরা স্ট্র্যামোনিয়াম (Datura stramonium)	আরথ্রাইটিস, গলা ফোলা
৪৫) আকন্দ	ক্যালোট্রপিক্‌স জাইগ্যান্টি (Calotropics gigantea)	পাতলা পায়খানা
৪৬) কেন্দু	ডায়সপিরস টোমেন্টোসা (Diospyros tomentosa)	আরথ্রাইটিস, একজিমা, ঘা
৪৭) পেঁয়াজ	অ্যালিয়াম সেপা (Allium cepa)	মৌমাছি/ বোলতার কামড়
৪৮) জবা	হিবিসকাস রোজা সাইমেনসিস (Hibiscus rosa simensis)	ওটাইটিস, পেটফাঁপা, মুরগীর সাদা ডায়ারিয়া
৪৯) অশোক	সারাকা অশোকা (Saraka asoka)	গরম না হওয়া
৫০) অশ্বত্থ	ফিকাস রেলিজিওসা (Ficus religiosa)	গরম না হওয়া, কৃমি
৫১) আখ	সাচ্চারুম সাইনেন্স (Saccharum sinense)	গরম না হওয়া, সর্দি, কফ, পেটফাঁপা
৫২) তুলসী	ওসিমাম স্যাংটাম (Ocimum sanctum)	গরম না হওয়া, জন্ডিস
৫৩) বাসক	আধাটোডা ভাসিকা (Adhatoda Vasica)	সর্দি, কফ, গর্ভপাত
৫৪) তেজপাতা	সিন্নামোমাম টামালা (Cinnamomum tamala)	সর্দি, কফ,
৫৫) তামাক	নিকোটিয়ানা ট্যাবাকাম (Nicotiana tabacum)	ইয়ক্‌গল, পেটফাঁপা, ঘায়ের পোকাতে
৫৬) সরিষা	ব্রাসিকা নাইগ্রা (Brassica nigra)	ইয়ক্‌গল
৫৭) কাঁঠাল	অরটোকার্পাস হেটারোফাইলাস (Artocarpus heterophyllus)	ফুল না পড়া
৫৮) ঈশ্বরীমূল	অ্যারেস্টোলোচিয়া ইন্ডিকা (Aristolochia indica)	সাপের কামড়, একজিমা
৫৯) খসখস	ভেটিভেরিয়া জিজানইডিস (Vetiveria Zizanoides)	সাপের কামড়
৬০) আন্র	স্পাইনিফেক্‌স পিনাটা (Spinifex pinnata)	সাপের কামড়
৬১) লাউ	লাগেনেরিয়া সিসেরারিয়া (Lagenaria siceraria)	দুধ বাড়াতে
৬২) কচু	কোলোকাসিয়া এস্‌কুলেন্টা (Colocasia esculenta)	দুধ বাড়াতে
৬৩) গুলঞ্চ	স্টিফানিয়া জ্যাপোনিকা (Stephania japonica)	দুধ বাড়াতে
৬৪) কাঁটানোটে	অ্যামারেন্থাস স্পাইনোসাস (Amarenthus spinosus)	দুধ বাড়াতে
৬৫) মাসকলাই	ভিক্‌টোরিয়া মুনগো (Victoria mungo)	দুধ বাড়াতে
৬৬) আমলকী	এম্‌ব্লিকা অফিসিনালিস (Emblica officinalis)	জন্ডিস, পেটফাঁপা
৬৭) অড়হর কলাই	ক্যাজানুস কাজন (Cajanus cajan)	জন্ডিস
৬৮) কলমী	রিভিয়া হাইপোক্রাটারিফর্মিস (Rivea hypocrateriformis)	জন্ডিস
৬৯) ভুঁই আমলা /ভূমি আমলকী	ফাইলেন্থাস্ ফ্র্যাটারনাস (Phyllanthus fraternus)	জন্ডিস
৭০) জায়ফল	মিরিস্টিকা ফ্র্যাগরেন্স (Myristica fragrans)	গলাফোলা
৭১) বেগুনা	স্মিথিয়া মেলোনগেনা (Smithia melongena)	এঁযো
৭২) হুড়হুড়িয়া	ক্লিয়োম আইসোসান্দ্রা (Cleome icosandra)	একজিমা
৭৩) আতা	অ্যানোনা স্কোয়ামোশা (Annona squamosa)	ঘায়ের পোকাতে
৭৪) জাম	সিজগিয়াম জ্যাম্বোলেনাম (Syzgium Jambolanum)	ঘা
৭৫) কুচিলা	স্ট্রিকনস নাক্‌স ভোমিকা (Strychnos nuxvomica)	ঘা
৭৬) সূর্যমুখী	হেলিয়ান্থাস অ্যানাস (Helianthus annus)	ঘা
৭৭) মেথি	ট্রিম্‌গোনেলা ফোম গ্রাসিল (Trigonella foeum gracelum)	পালানে প্রদাহ
৭৮) কদম	অ্যান্‌থ্রোসেফালাস্ কদম্ব (Anthrocephalus cadamba)	পেটফাঁপা
৭৯) সোমরাজ	সেন্ট্রাথিরাম্ অ্যান্‌থেলমিন্‌টিকাম্ (Centrathierum anthelminticum)	পেটফাঁপা
৮০) ইন্দ্রজান	রাইটিয়া টিংটোরিয়া (Wrightia tinctoria)	পেটফাঁপা
৮১) বিছাতি	ট্রেড্‌স্ক্যান্‌টিয়া ইন্‌ভলুক্রাটা (Tradescantia involucrata)	ঘায়ের পোকাতে
৮২) তিল	সিসামাম্ ইন্ডিকাম (Sesamum indicum)	ঘায়ের পোকাতে
৮৩) খেঁজুর	ফোনিক্‌স ডাকটাইলিফেরা (Phoenix dactylifera)	কৃমি
৮৪) ডালিম	পুনিতা গ্রানাটাম (Punita granatum)	কৃমি
৮৫) পেঁপে	কারিকা পাপেয়া (Carica papaya)	কৃমি
৮৬) মহুয়া	মধুকা ইন্ডিকা (Madhuca indica)74740111	মুরগী বসন্ত

দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার ঃ রোজগারের হাতিয়ার

অধ্যাপক পিনাকী রঞ্জন রায়
দোহরসায়ন বিদ্যা বিভাগ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ সমাজের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও জনসাধারণকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার মাধ্যমে। দুধ থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরী ও তাঁর বিপণন গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের বিভিন্ন শর্তগুলি সঠিকভাবে পূরণ করতে সক্ষম। বিশেষভাবে উপকারী জীবাণুর মাধ্যমে দুধকে গেঁজিয়ে তার থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী করে তার বিপণনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা বিশেষ করে উপার্জনের পথ সুগম করতে পারেন। এই দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি বাড়িতেই ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বা সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব।

এদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই 'গাঁজান দুধ' জাতীয় খাবার মানুষের খাদ্য তালিকায় আছে। এগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হল দই, লস্যি ও ছানা। এই দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলির প্রভূত পরিমাণে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগুণ বর্তমান এবং তা অতিরিক্ত দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুধ সংরক্ষণেরও উপায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় স্বাভাবিক উষ্ণতাতে প্রচুর তরল দুধ পচে নষ্ট হতো যদি দই তৈরী করা না যেতো। দই ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য 'গাঁজান দুধ' জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। এগুলি হল লস্যি, ছানা, শ্রীখন্দ, চুপড়ি, মাঠা এবং ছাস ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মূলতঃ দই এবং লস্যি অধিক জনপ্রিয়। তবে অন্যান্য দ্রব্যগুলিরও যথেষ্ট চাহিদা আছে।

দই উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ দই বা দধি সাধারণত উপকারী জীবাণু ব্যবহারের মাধ্যমে দুধকে গেঁজিয়ে তৈরী করা হয়। এই খাবার স্বাদে এবং পুষ্টিতে যথেষ্ট উন্নতমানের হওয়ায় দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এটি খান। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় একটি পদ হিসাবে বা তৈজবর্ধক পানীয় হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। সরাসরি খাবার জন্য দুরকমের দই তৈরী করা হয়। মিষ্টি দই এবং টক দই। একটি সুগন্ধযুক্ত দই এবং অপরটি অম্লগন্ধযুক্ত। পূর্বভারতের দেশগুলিতে 'মিষ্টি দই' একটি অতি পরিচিত এবং জনপ্রিয় খাবার।

মিষ্টি দই উৎপাদনের জন্য মূলতঃ গোরুর বা মহিষের দুধ ব্যবহার করা হয়। দুধকে প্রয়োজনমত চিনি দিয়ে ফোটানো হয় প্রথমে। পরে হালক আঁচে অনেকক্ষণ রাখা হলে দুধটা একটু ঘন এবং হাল্কা বাদামী রং ধারণ করে। একটি মিষ্টি গন্ধও পাওয়া যায়। এই দুধকে ঠান্ডা করে নিয়ে উপকারী জীবাণু যা প্রচলিত বাংলায় 'সাজা' নামে পরিচিত, মেলানো হয়। সাধারণত পরবর্তী দই প্রস্তুত করার জন্য 'সাজা' হিসাবে আগের দিনের দই এর সামান্য অংশ রাখা হয়। সমস্ত মিশ্রণটি একটি মাটির অথবা কাঁচের বা সেরামিক এর পাত্রে রাখা হয়। হাল্কা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পাত্রগুলি ঢেকে সুবিধাজনক জায়গায় এমনভাবে রাখা হয় যাতে কোনো নড়াচড়া না হয়। সারা রাত এর মধ্যে দুধ-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় 'গাঁজান' প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে সকালে জমাট দই তৈরী হয়ে যায়। দই জমে যাবার পর উৎপাদিত দইকে কোনো ঠান্ডা ঘরে বা 'ফ্রীজ' এর মধ্যে রাখা দরকার পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করার জন্য।

লস্যি উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ লস্যি ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। লস্যির বাজার গ্রাম, ছোট শহর ও বড় শহরে ছড়িয়ে আছে। অসংখ্য মানুষ ছোট মাপে লস্যি প্রস্তুত ও বিক্রি করার মাধ্যমে রোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছেন। অল্প ঠান্ডা জলে পরিমানমতো লবণ ও চিনি দিয়ে দই ভালো করে ঘুঁট নেওয়া হয়। কাঠের একটি 'কাঁটা' দিয়ে অথবা মিক্সিতে এই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। মেশানোর প্রক্রিয়াটি যত ভালো হবে, লস্যির স্বাদও তত ভালো হবে। এই পানীয়র মধ্যে অনুসঙ্গ হিসাবে বরফকুঁচি বা বিভিন্নরকমের লবণ বা মশলাও ব্যবহার করা হয়। লস্যি উৎপাদন ও বিক্রিতে যথেষ্ট পরিমাণ লাভের সুযোগ থাকে। এটিকে ঘরের তাপমাত্রায় সাধারণত ২-৩ দিন ভালোভাবে রাখা যায়। ফ্রীজের তাপমাত্রায় এটি প্রায় ১ সপ্তাহ অবিকৃত থাকে।

মাঠা ও ছাচ বা ছাস উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ মাঠা গ্রীষ্মকালের একটি জনপ্রিয় পানীয়। দইকে বা গাঁজান মাখনকে ঠান্ডা জলের সাথে মিশিয়ে যন্ত্রে বা হাতে ঘুঁটতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি কিছুক্ষণ চালালে মাখনের দানা জলের উপর ভেসে ওঠে। মাখনের দানাগুলি কাঠের হাতা দিয়ে সযত্নে তুলে নিলে জলের মতন যে তরল পদার্থটি পড়ে থাকে সেটি 'মাঠা'। পানীয়টি যথেষ্ট পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। এর স্বাদ বাড়ানোর জন্য অনুসঙ্গ হিসাবে এর সাথে বিভিন্ন লবণ বা মশলা যোগ করা হয়।

গাঁজান দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যর সুবিধা ঃ গ্রামীণ স্তরে চাষীদের ঘরে দৈনিক যে কাঁচা দুধ উৎপন্ন হয়, অনেক সময়েই তা সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে সংগঠিত দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেওয়া যায় না। ফলে সেগুলি অপচয় হয়, অথচ দই বা লস্যি উৎপাদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত দুধ এর সঠিক ব্যবহার সম্ভব। এই উৎপাদন প্রক্রিয়াটি ঘরে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব এবং মহিলারা এই দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করতে পারে। তরল দুধ এর চেয়ে 'গাঁজান দুধ' বা তার থেকে তৈরী দ্রব্যের অনেকগুলি সুবিধা বর্তমান -

১. দই বা লস্যি বিক্রি করে দুধের চেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন সম্ভব। বিশেষ করে ছোট উৎপাদকেরা এর থেকে বেশী লাভবান হলেন।
২. দই বা লস্যি তরল দুধের থেকে সহজপাচ্য।
৩. ভারতের মতো ক্রান্তীয় দেশে স্বল্পকালীন দুধ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হল দই তৈরী করা। এতে দুধের পুষ্টিগুনের যথাযথ সংরক্ষণ হয় এবং স্বাস্থ্যগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধের বিপণন যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং গ্রামীণ স্তরে যেখানে তরল দুধ পরিবহনের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, সেখানে মানুষেরা তাদের মূল জীবিকার পাশাপাশি ঘরে উৎপন্ন অতিরিক্ত দুধকে গেঁজিয়ে দই এবং লস্যি উৎপাদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিশেষতঃ ঘরের মহিলারা তাদের অতিরিক্ত সময়ে এই দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি উৎপাদন করে তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

গাঁজলা দুধের প্রয়োজনীয়তা

সন্তু মন্ডল ঃ বাছুর হল কোন গোখামারের ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড এবং অর্থনৈতিক দিক নির্ধারণকারী। বাছুরের সঠিক পুষ্টির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচর্যা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সবে প্রসুত গরুর প্রথম দুধ বাছুরের পর্যাপ্ত পুষ্টি ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা প্রদান করে। বাছুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে থাকে কিন্তু অমরা ইমিউনোগ্লোবিউলিনদের মায়ের শরীর থেকে বাছুরের দেহে প্রবেশে বাধা দেয়। তাই সদ্যজাত বাছুর কম অনাক্রমতা নিয়ে জন্মায় এবং এর জন্য মায়ের প্রথম দুধ বাছুরের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কোলোস্ট্রামে থাকা উপযুক্ত পুষ্টি বাছুরের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অনাক্রমতা অর্জন করতে উপযুক্ত পরিমাণ ইমিউনোগ্লোবিউলিনের প্রয়োজন যা কিনা মায়ের প্রথম দুধ থেকে একমাত্র পাওয়া সম্ভব। সাধারণত উন্নতমানের কোলোস্ট্রামে ৫০ মিলিগ্রাম/মিলিলিটার বা তার বেশি ইমিউনোগ্লোবিউলিন থাকে এবং এর থেকে কম গুণগত মানের কোলোস্ট্রাম বাছুরে বিভিন্ন প্যাথোজেনিক সংক্রমণ, মৃত্যুহার বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে উন্নতমানের কোলোস্ট্রাম জন্মের পর সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ানো দরকার কারণ জন্মের ১২ ঘন্টা পর থেকে ইমিউনোগ্লোবিউলিনের শোষণহার কমে ৫০% হয়ে যায়। তাই মায়ের প্রথম দুধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পান করানো দরকার। কিন্তু এটাও জানা দরকার কোলোস্ট্রাম অবশ্যই কোনো রোগগ্রস্ত গরু থেকে না খাওয়ানোও হয় এবং বোতলে বা বালতিটিতে খাওয়ানোর সময় একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বোতল বা বালতি ব্যবহার করা উচিত, কেননা বিভিন্ন জীবাণু ইমিউনোগ্লোবিউলিনের রিসেপটর ব্লক করে এর শোষণ হার কমিয়ে দেয়। সুতরাং, বর্তমান সময়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোপালনে কোলোস্ট্রামে ইমিউনোগ্লোবিউলিনের পরিমাণের পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা একান্ত দরকার। কিছু সহজ পদ্ধতি দ্বারা কোলোস্ট্রাম গুণগতমান ও তার মধ্যে থাকা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের পরিমাণ সহজে জানা যায় এবং এগুলি ভালোভাবে বাছুরের পরিচর্যার কাজে ব্যবহার করা যায়।

মুক্তাঙ্গন প্রথায় বনরাজা জাতের মুরগী পালন

অমিতাভ রায় ঃ মুর্শিদাবাদে প্রধানত মুসলমানদের (প্রায় ৮০-৮৩%) বসবাস। এদের অধিকাংশই আমীষ জাতীয় খাদ্যের জন্য প্রাণীজ মাংস বা তার পণ্যের উপর নির্ভরশীল। বাজারে গরু মাংসের পরেই মুরগীর মাংস ও তার ডিমের চাহিদা উল্লেখযোগ্য। প্রধানত গ্রামের মহিলারাই দেশী মুরগী পালন করেন। দেশী ডিম ও মুরগী মাংসের বিকল্প হিসেবে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ 'সম্মুখসারীর প্রদর্শনী ক্ষেত্র' এর মাধ্যমে এই প্রজাতীর মুরগীকে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। মোট ৪৭জন মহিলাকে ৯৪০টা মুরগী বিতরণ করা হয়েছে শেষ দুই বছরে (২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫)। মহিলাদের 'উন্নত মুক্তাঙ্গন প্রথায় বনরাজা মুরগী পালন' নিয়ে ৪ দিনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল। উক্ত কেন্দ্রের প্রাণী বিশেষজ্ঞ মুরগী বিতরণের পর নিয়মিত সময় অন্তর মুরগীকে টীকাকরণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন। উল্লেখ্য ৪৭জন মহিলার মধ্যে ৪ জন তাদের স্বামীকে নিয়ে এই বনরাজা মুরগীর খামার তৈরী করেছেন ব্যবসায়ীকভাবে যারা হলেন মহঃ সাম্বায়ুন আলি (ইসাপুর গ্রাম), কাউসার আলি (গুধিয়া গ্রাম), মি. বিবেক সরকার (বামুনিয়া গ্রাম) ও মি. নবীন মন্ডল (বেলীয়াপুকুর গ্রাম)। এদের মধ্যে কাউসার আলি সর্বাধিক ২৫০টি মুরগী নিয়ে খামার তৈরী করেছেন। ঐ খামার থেকে তিনি মাসে প্রায় ৩০০০টি উর্বর ছন্দ্রন্দ্বজ্জন্দ্বপ্তন্দ্বগ্ন ডিম পান। এই উর্বর ডিমগুলি তিনি বহরমপুর রাজ্য মুরগী খামার-এ বিক্রি (১০টাকা প্রতি পিস) করেন এবং কিছু পাশাপাশি মহিলাদের বিক্রি (৪টা প্রতি পিস) করেন। এই ডিম নিয়ে মহিলারা বাড়ির দেশী কুরকী মুরগী দিয়ে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটান। কাউসার বাবু মাসে প্রায় ৩০,০০০ উপার্জন করেন এই উর্বর ডিম ও জীবন্ত পুরুষ মুরগী বিক্রি করে। তিনি ১২০টাকা প্রতি কেজি দামে জীবন্ত মুরগী বিক্রি করেন। এই আর্থিক বছরে (২০১৫-১৬) আরোও ১৭জন ব্যবসায়িকভাবে এই মুরগীর খামার করেছেন।

গোখাদ্যে ইউরিয়ার ব্যবহার

চিন্ময় মাজি ও কৌশিক পাল ঃ পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত ও সঠিক পরিমাণে গোখাদ্য খুব কম গোরুর ভাগ্যেই জোটে। প্রায় সমস্ত গো-পালক গোরুকে সমস্ত ধরণের খাবার না দিয়েই তার কাছে মাত্রাতিরিক্ত দুধের উৎপাদন আশা করে থাকেন। অজুহাত হিসাবে সুবজ ঘাসের অপ্রতুলতা, কেনা তৈরি দানাখাদ্যের বেশী দাম ইত্যাদিকে দায়ী করে থাকেন। অথচ, বেশীর ভাগ গো-পালক এটা জানেন না যে খুব কম খরচে ইউরিয়ার মতো সহজলক্ষ্য উপাদান খড়ের সাথে মিশিয়ে তা অত্যন্ত বেশী গুণ সম্পন্ন খাবারে পরিণত করা যায়। বিশেষ করে যে সমস্ত মরসুমে খাবারের অভাব ঘটে, সেই সমস্ত মরসুমে গোখাদ্যে ইউরিয়া, গুড় এবং খনিজ লবণের মিশ্রণ অত্যন্ত কার্যকরী একটি বিকল্প খাদ্যব্যবস্থা। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী ইউরিয়া গোরুর খাবারে মিশে গেলে বিষক্রিয়াও হতে পারে। সঠিক মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহার করলে, তা গোরুর দেহে প্রোটিনের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সাধারণত ছোট করে কাটা বিচালির সাথে ইউরিয়া সঠিক পরিমাণে মিশিয়ে খাওয়ালে, খড়ের গুণাগুণও বাড়ে, আবার গোরুর পাকস্থলীতে এই ইউরিয়া বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রোটিন উৎপন্ন করে যা দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। খড় বা বিচালি ছোট করে কেটে নিতে হবে। একটি পাত্রে ১ লিটার পরিষ্কার জল নিয়ে, ২০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০ গ্রাম চিটেগুড় মেশাতে হবে। এই মিশ্রণ ১ কেজি কাটা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যাবে। এছাড়াও ১০ লিটার জলে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১কেজি চিটেগুড়, ২০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার, ১০০ লবণ, ১/২ চামচ (৩ গ্রাম) ভিটামিন এ-ডিথ্রি ভালো করে মেশাতে হবে। এই মিশ্রণ ১০ কেজি ছোট করে কাটা খড়ের উপর ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেশাতে হবে। মেশানোর সময় খড়, মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে যাতে দুই দিকই মিশ্রণ পায়। এরপর এই মিশ্রণ ভালো করে শুকিয়ে নিলে তা গোখাদ্য হিসাবে ২-৩ দিন ব্যবহার করা যায়। কখনও কখনও ৪০ লিটার জলে ৪ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে তা ১০০ কেজি কাটা খড়ের উপর ছিটিয়ে আগের পদ্ধতির মতো মিশিয়ে একটি বড়ো পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে ভালো করে মুড়ে ১০ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ঐ খাবার যতটা প্রয়োজন বের করে ২-৩ ঘন্টা বাইরে রেখে, তারপর গরুকে খেতে দিতে হবে। প্রতিদিন বাকি মিশ্রণ আবার পলিথিনে ভালো করে মুড়ে রেখে দিতে হবে। ৬ মাসের কম বয়সী বাছুরকে এই খাবার খাওয়ানো যাবে না। একেবারে এই খাবার হঠাৎ না দিয়ে আস্তে আস্তে অভ্যাস করাতে হবে। ইউরিয়া খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে, দলা পাকালে চলবে না। প্রাণী যেন পরিষ্কার জল বেশী খায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইউরিয়া দেওয়া ক্ষেতের জল যেন না খায়। উৎসাহ বা লোভের বশে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী ইউরিয়া মিশিয়ে ফেললে, বিষক্রিয়া হতে পারে। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী পড়ে ছটফট করে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, পেট ফুলে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, শেষে খিঁচুনি হয়ে মারা যায়। এই ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসককে খবর দিতে হবে। প্রাণীটিকে প্রচুর ঠান্ডা জল খাওয়াতে হবে। ভিনিগার (৩-৪ লিটার) খাওয়ালে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। শিরার মধ্যে ৫% DNS স্যালাইন করা যেতে পারে।

জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র একনজরে

বিপ্লব দাশ ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সারা বছর ধরে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ, ক্ষেত্র প্রদর্শন ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন। এছাড়াও প্রাণী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্যশিবির এর মাধ্যমে ফারমার্স ক্লাব, SHG, NGO সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতা শিবির আয়োজন করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর, নাবার্ড, জেলা গ্রাম উন্নয়নকেন্দ্র, ত্রিস্তরিও পঞ্চায়েতিরাজ এর সাথে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাথে কৃষক সমাজের অংশিদারিত্ব ও ভাগিদারিত্ব বাড়ান এবং আধুনিক প্রযুক্তির পরিচিতি ও মেলবন্ধন ঘটিয়ে একক এলাকা থেকে বেশি উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বৎসরের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কিছু সফল কর্মসূচী ঃ

● নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় কৃষক সংঘ ও SHG, NGO সদস্যদের নাবার্ডের উল্লেখিত বিষয় যেমন কেচোঁসার তৈরী, অ্যাজোলা চাষ, ঘরোয়া সবজী বাগান, শস্যবৈচিত্রায়নের মাধ্যমে অপ্রচলিত সবজিচাষ, তৈলবীজ ও ডাল শস্যের চাষ, মাটির স্বাস্থ্য ভালো করা, হাঁস, মুরগি ও ছাগল পালনের মধ্য দিয়ে পুষ্টি ও জীবিকার সুরক্ষা ও সুনিশ্চিত করা। রোগ পোকার সুসংহত দমন পদ্ধতি, জল ও উদ্ভিদ পুষ্টির সুসংহত ব্যবহার ইত্যাদি।

● জেলা গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় চিহ্নিত ব্লকের (মেটেলি ও ধুপগুড়ি) পিছিয়ে থাকা মহিলাদের আবাসিক প্রশিক্ষণ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে যেমন উন্নত মুরগি ও ছাগল পালন, সবজি বাগান তৈরী, নার্সারী ও কেঁচোসার তৈরী।

● SMS PORTAL এর মাধ্যমে কৃষকদের এলাকা উপযোগী ও সময়োপযোগী পরামর্শ দেওয়া হয়। মৃত্তিকা পবীক্ষার মাধ্যমে মৃত্তিকা স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ কর্মসূচী করা হয়।

● কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র ও নাবার্ডে যৌথ উদ্যোগে ময়নাগুড়ি ব্লকের ভাংঙ্গামালি গ্রামের আয়বনী ফার্মার্স ক্লাব এর মাধ্যমে Vigilance Awarness Week - ২০১৬ পালন করা হয়। উক্ত শিবিরে নাবার্ড, কৃষিআধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার শিক্ষক ও সমাজসেবীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভালো বীজ, সার ব্যবহারের সাথে কৃষকদের সংঘবদ্ধভাবে আধিকারিকদের সহায়তা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

● পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও আর্থিক দপ্তরের সহায়তায় ময়নাগুড়ি ও মাল ব্লকের বনবস্তির যুবকদের উন্নত মুরগি পালন, সবজি ও ফলবাগান তৈরী করার মাধ্যমে পুষ্টি ও জীবিকার সুনিশ্চিত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে অন্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে।

● পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিদপ্তরের (জেসপ বিল্ডিং - কলকাতা) আর্থিক সহায়তায় জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তরদিনাজপুর জেলার ২০ জন কৃষিআধিকারিক ও ৬০ জন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মীদের নিয়ে ২ দিনের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে রাজ্য ও জেলার কৃষি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হল। প্রধান বিষয় ছিল ভারত সরকারের পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার (PKVY) মাধ্যমে জৈবিক চাষের প্রযুক্তি ও এলাকা বৃদ্ধি করা।

● আতমা (ATMA) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কৃষিশিক্ষামূলক ভ্রমণ, খামার পরিক্রমা ও প্রদর্শনীক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে।

● জাতীয় খাদ্যসুরক্ষা মিশনের অধীনে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মাল ব্লকের ক্রান্তি, ময়নাগুড়ি ব্লকের সিংগিমারি, রথের হাট, ব্যাংকান্দি, বক্সীডাঙ্গা এবং ধুপগুড়ি ব্লকের কালির হাট ও গাদেয়ারকুঠি গ্রামে ৫০ হেক্টর জমিতে প্রায় ২ শতাধিক কৃষক ডাল ও তৈলবীজ চাষ করেছেন।

● উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্পের ছত্রত্নগ্ন আওতায় ময়নাগুড়ি ব্লকের কালিপুর বনবস্তি, বারোহাতি ও চুড়াভাডার গ্রামের এবং ধুপগুড়ি ব্লকের ফটকটারী গ্রামে প্রশিক্ষণ, চারা বিতরণ, নিড়ানি যন্ত্র বিতরণ ও নলকূপ বসানো, মুরগি ও শুকরের প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে।

● জাতীয় তৈলবীজ মিশনের অধীনে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ময়নাগুড়ি ব্লকের সিংগিমারিতে নাবার্ড পরিচালিত বাগজান কৃষক সংঘে (Farmers Club & FPO) ছোট তেলমিল স্থাপন করা হয়েছে এবং যে মিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী মাননীয় পূর্নেন্দু বসু মহাশয় গত 4th August ২০১৬ পালন করা হ শুভ উদ্বোধন করেছেন ব্লক, জেলা ও রাজ্যের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও চুরাভান্ডার কৃষিসমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগে সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় অরণ্য সপ্তাহ - ২০১৬ উদ্‌যাপনের সাথে আলোচনা ও চারা বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। শতাধিক কৃষক পরিবারকে পেয়ারা, লেবু ও তেজপাতার চারা বিতরণ করা হয়।

● ভারত সরকারের নির্দেশিকায় সারা বছর ধরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান মিশনের আওতায় বিভিন্ন গ্রামীণ হাট, বিদ্যালয় ও গ্রামে স্বচ্ছতা অভিযান ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে, নিজস্ব গ্রাম SHG & Farmers Club এর সদস্যদের নিয়ে স্বচ্ছ বাড়ি, স্বচ্ছ গ্রাম, স্বচ্ছ খামার, স্বচ্ছ খেত্র, স্বচ্ছ পুকুর এবং আবর্জনা দিয়ে জৈবসার ও কেঁচোসার তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

● কৃষিদপ্তর, নাবার্ড এর সাথে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যৌথভাবে সহভাগি পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলাস্তরিও কৃষিচর্চা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, আবহাওয়া পরিবর্তন ও জল নিয়ে স্বচেতনতার শিবির, পরিবেশ দিবস ও বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, KCC কার্ড নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে চলেছে।

জানতে চাই

প্রশ্ন ঃ আমি ক্ষুদ্র মুরগী চাষী। আমার একটি ব্রয়লার ফার্ম আছে এবং এই ব্রয়লার ফার্মের আয় থেকে আমার পরিবার চলে। আমি আপনার নিকট হইতে ব্রয়লার ফার্ম সম্পর্কে জানতে চাই। বিস্তারিত কি ব্যবস্থা আছে জানালে বাধিত হব।

জয়দেব সাহা, বর্ধমান

উত্তর ঃ আপনার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ। ব্রয়লার ফার্মের উপর প্রশিক্ষণ নিতে হলে আপনাকে স্থানীয় ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে সরকারীভাবে দেওয়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এছাড়া জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণ, বেলগাছিয়াতেও যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমি একজন প্রাণীপালক। কৃষি কাজের পাশাপাশি প্রাণীপালনের কাজও করি। আমি ছাগল পালন করতে আগ্রহী। ছাগলের কোন প্রজাতির পালন লাভজনক হবে জানালে বাধিত হব।

দয়ানন্দ বিশ্বাস, বাঁকুড়া

উত্তর ঃ ছাগলপালন স্বাভাবিক ভাবেই লাভজনক। বর্তমানে ভারতে প্রায় অনেক স্বীকৃত প্রজাতির ছাগল আছে। লাভের দিক বিবেচনা করলে 'বাংলার কালো ছাগল' প্রজাতিই শ্রেষ্ঠ। বছরে প্রায় দুবার বাচ্চা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবার দুই বা তার বেশী বাচ্চা দেয়। এছাড়াও অল্পসময়ের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও এই ছাগলের বেশী। তাই সার্বিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাংলার কালো ছাগল প্রতিপালনই লাভজনক।

অধ্যাপক অরুণাশিস্ গোস্বামী, অধিকর্তা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭, ক্ষুদিরাম বসু সরণী, কলকাতা - ৭০০০৩৭ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত,
সম্পাদক ঃ ডঃ অরুণাশিস্ গোস্বামী। মুদ্রণে ঃ মেসার্স এস. দত্ত, ৫৮/১, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৭, চলভাষ ঃ ৯৮৩০২৫৬৪২২